শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতি

অৰ্চনা বন্দ্যোপাধ্যায়

বি. বি. কুণ্ডু গ্র্যান্ড সন্স

অষ্টাদশ অধ্যায়

শৃঙ্খলা (Discipline)

শিক্ষা শব্দটির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কিছু বিধিসম্মত প্রক্রিয়া যুক্ত। এই শিক্ষার আর এক অঙ্গ হল শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা শব্দটির ইংরাজি শব্দ হল 'Discipline'। Discipline শব্দটি Latin শব্দ থেকে এসেছে। Discipline শব্দটির সঙ্গে Disciple শব্দটি যুক্ত। Disciple সেই যে শেখে, তাই শৃঙ্খলা বা Discipline-এর অর্থ হল—আদিম প্রবৃত্তিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক একটি প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী শেখে। মানবজীবনের সাফল্য নির্ভর করে শৃঙ্খলা, সংযমসাধন-এর ওপর। তাই শিক্ষা পরিবেশে ব্যক্তিত্ব গঠন ও সমাজ কল্যাণ উভয়ের সমন্বয়সাধনের জন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলা। আজ আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শৃঙ্খলা মুক্তশৃঙ্খলা বা আত্মশৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলা বিবর্তিত হয়েছে নানা স্তর অতিক্রম করে। সেই স্তরগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

প্রথমে আমরা চলে যাব সেই আদিম প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায়, যেখানে শিক্ষার্থীকে মনে করা হত বয়স্ক মানুষের ক্ষুদ্র সংস্করণ (Adult miniature)। প্রাচীন কালে আরও একটি ধারণা ছিল শিশুর জন্ম পাপ থেকে। শিক্ষার কাজ—শিশুর প্রকৃতিকে পুনর্গঠন করা (to remake the nature of the child) অর্থাৎ তাকে পাপমুক্ত করা। তাই সেই শিক্ষাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ছিল অবদমনমূলক। শিশুর ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা—সব কিছুকে অবদমন করা। তাই শাসনের দণ্ড ছিল শিশুকে বশে নিয়ে আসার একমাত্র উপায়। এই অবদমনমূলক উপায় একান্তভাবেই নেতিবাচক বা Negative ছিল। একটি আপ্ত বাক্য তো হয় প্রচলিত ছিল—দণ্ডকে ছুটি দিলে, শিশু নষ্ট হয়ে যাবে (Spare the rod and spoil the child)। এই অবদমনমূলক শৃঙ্খলা মনস্তত্ত্ব ভিত্তিক নয়, শিশুর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রতিকূল। তাই এই ধরনের শৃঙ্খলাকে আধুনিক শিক্ষাজগৎ কখনো গ্রহণ করতে পারেনি।

পরবর্তী যুগে আর এক ধরনের শৃঙ্খলার ধারণা এসেছিল, তা হল ব্যক্তির মানসিক স্তরগুলে পরোক্ষভাবে একটি ছাপ (Impression) সৃষ্টি করা। এই তত্ত্বকে impression-ism theory of discipline বলা হয়। এই তত্ত্বানুসারে শিক্ষার্থীর সামনে একটি আদর্শ উদাহরণ থাকবে, সেই আদর্শ অনুসারে সে শৃঙ্খলা-সম্পন্ন হয়ে উঠবে। কোনো মহাপুরুষ বা বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তির প্রভাব মানুষকে উন্নত করে, সুশৃঙ্খল করে তোলে, তার ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে, মানসিক ধৈর্য গড়ে তোলে। এই শৃঙ্খলা অবদমনমূলক শৃঙ্খলা

অপেক্ষা উন্নততর, কিন্তু এটিও সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক নয়, এখানেও একটি পরোক্ষ চাপ কাজ করে।

আধুনিক শিক্ষা জগতে শৃঙ্খলার অর্থ একেবারেই নতুন মোড়কে নিজেকে উপস্থাপিত করল। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক Aristotle রোমের Quintilion, Comenius, Erasmus, Petrarch এরা সকলের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। তাই আত্মশৃঙ্খলার বীজ উপ্ত ছিল, পল্লবায়িত হল অষ্টাদশ শতক থেকে, বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের শিক্ষাভাবনার মধ্য দিয়ে। রুশো শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জনক, তিনি শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার ওপর শিশুর নিয়ন্ত্রণকে ছেড়ে দিলেন। তিনি মনে করতেন—শিশু নিজের কাজের ফলাফল অনুযায়ী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে, এটিকে বলা হয় Discipline by natural consequences। রুশোর মতাদর্শ গৃহীত হল সমগ্র জগতে। তাঁর অনুগামী শিষ্যগণ, যেমন, পেস্তালৎসি, ফ্রেডারিক হার্বার্ট, মাদাম মন্তেসরী প্রভৃতি সকলেই শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে মুক্তশৃখল বা আত্মশৃঙ্খলার পক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন। এঁরা বাস্তবক্ষেত্রে আত্মশৃঙ্খলার নীতিগুলিকে পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি, শিক্ষকের সহযোগিতার দ্বারা প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে আত্মশৃঙ্খলা সদর্থক শৃঙ্খলা। সক্রিয়তা, স্বাতঃস্ফূর্ততার পরিবেশেই শিশু সবচেয়ে বেশি আত্মনিয়ন্ত্রিত হয়। প্রাচ্য জগতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনে, গান্ধীজী তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায়, এই আদর্শ আত্মশৃঙ্খলার তত্ত্বই প্রচার করেছেন ও প্রয়োগ করেছেন। শিশুর বিকাশের পক্ষে, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ আত্মপ্রকাশে ও সমাজের সার্বিক মঙ্গলসাধনে আত্মশৃঙ্খলার কোনো বিকল্প থাকতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রশ্ন উঠতে পারে! আত্মশৃঙ্খলা ও শাসন (Discipline and order) এদুটির সম্পর্ক কী? শৃঙ্খলা ও শাসন দুটি বিপরীতমুখী হলেও শৃঙ্খলা রক্ষায় কখনও কখনও শাসন বা order-এর গুরুত্ব থাকে। *প্রথমত,* শাসন বা order বাইরের বা External শৃঙ্খলা অন্তর্জাত বা internal। শাসন অবদমনমূলক, শৃঙ্খলায় অবদমনের কোনো জায়গা নেই। *দ্বিতীয়ত,* শাসনে আনন্দ, স্বাধীনতা, স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না, শৃঙ্খলার মধ্যে আনন্দ, স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে। *তৃতীয়ত,* শাসনের একটি উদ্দেশ্য থাকে, শৃঙ্খলার উদ্দেশ্য শৃঙ্খলাই, জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রেডারিক হার্বার্ট বললেন, শাসনের উদ্দেশ্য শৃঙ্খলা গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীরা যখন শেখার আনন্দে আত্মসক্রিয় হয়ে থাকে, তখনই শৃঙ্খলা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে। ব্যক্তি তখনই বলতে পারে—'মুক্ত আমি, স্বতন্ত্র আমি, বিশ্বের আনন্দধারা আমি।'

বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আধুনিক শৃঙ্খলা আত্মশৃঙ্খলা ও মুক্তশৃঙ্খলায় উন্নীত হয়েছে। মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মানুষ জন্মসূত্রে সৎ সুসংহত, পরিবেশ তাকে কলুষ করে তোলে। তাই প্রাচীন মতাদর্শ যে মানুষের জন্ম পাপ থেকে তা মিথ্যা। মানুষ জন্মসূত্রে স্বাধীন তার মানবতার প্রকাশ স্বাধীন ইচ্ছার দোলাচলে।

মুক্তশৃঙ্খলার মূল মন্ত্র হল 'স্বাধীনতা'। স্বাধীনতা শব্দটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে ভাঙলে পাওয়া যায় 'স্ব + অধীনতা' অর্থাৎ নিজের ওপরে নিজের নির্ভরতা। আত্মনির্ভরশীলতার আর একটি নাম আত্মপ্রত্যয়। এই

আত্মপ্রত্যয় একবার গড়ে তুলতে পারলে শিক্ষা সার্থক হয়, ব্যক্তির জীবনও সঠিক পথে চলতে পারে আর সমাজ এমন ব্যক্তিদের সমাহারে একটি সুসংঘবদ্ধ, নীতিঋদ্ধ সমাজ হয়ে ওঠে। ফ্রয়েবেলের কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা পরিকল্পনায় আত্মবিকাশ প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তোলা হত নানা উপহার (gifts) এবং কাজের (occupations) মধ্যে দিয়ে। শিশুরা নাচ গান, খেলাধুলো, ছড়া, আঁকা, গল্পবলা, গল্প শোনা ইত্যাদির মধ্যে আনন্দের জগৎ খুঁজে পেত, মুক্তির আনন্দে আত্মসক্রিয়তার বাতাবরণে তারা আপনার বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিকশিত করে তুলত। মাদাম মন্তেসরি শৃঙ্খলাকে কখনও অবদমনমূলক করে তুলতে চাইতেন না। তাঁর বিদ্যালয়ে শিশুরা আপনার মনে আত্মশৃঙ্খলমূলক (Didactic apparatus) উপকরণ নিয়ে নিজেদের গড়ে তুলতে চেষ্টা করত। শিক্ষিকা ছিলেন একজন পর্যবেক্ষক। শ্মশানের নিস্তব্ধতাকে (graveyard silence) শৃঙ্খলা বলে না। তাঁর ভাষায় 'পিনবিদ্ধ সারি সারি প্রজাপতি (rows of butterflies transfixed with pin)-কে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে থাকা বলে না। মুক্তশৃঙ্খলার প্রকাশ আত্মবিকাশে, সৃজনে, আনন্দে, সক্রিয়তায় ও স্বাধীনতায়। এমন শৃঙ্খলার পরিবেশ শিক্ষালয়ে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। কেমন করে মুক্তশৃঙ্খলার পরিমণ্ডল গড়ে তোলা যায়, সেই সম্পর্কে আলোচনা করব।

আধুনিক শিক্ষা প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার্থীদের দ্বারা গঠিত স্বায়ত্ত শাসন, যার দ্বারা অতি সহজেই শিক্ষামূলক পরিবেশে আত্মশৃঙ্খলা বা মুক্তশৃঙ্খলা গড়ে তোলা যায়। এই মুক্তশৃঙ্খলার মূল শর্ত হল আত্মনিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের সংযত করবে নানা কাজ কর্ম ও নিজেদের গড়া সংগঠনের মাধ্যমে।

এখন প্রশ্ন হল এই স্বায়ত্তশাসন বলতে আমরা কী বুঝি? স্বায়ত্তশাসনের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল—স্ব অর্থাৎ নিজের আয়ত্তে যে শাসন থাকে। অর্থাৎ আত্ম নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠিটি নিজেদের হাতে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই স্বায়ত্তশাসন প্রাচীন গুরুকুলেও ছিল। মেধাবী কোনো শিষ্য পঠনপাঠন প্রক্রিয়ায় গুরুকে সহায়তা করতেন। পরবর্তীকালে পাঠশালায় সর্দার পোড়ো প্রথা ছিল। গুরুমশাই প্রয়োজনবোধে যোগ্য কোনো ছাত্রকে সহাধ্যায়ীদের পড়ানো, তাদের সংযত করার দায়িত্ব দিতেন। এদেশে মিশনারীরা এই সর্দার পোড়ো অনুরূপ Monitorial system গড়ে তোলেন। এই হল শিক্ষক-শিক্ষণ প্রথার সূত্রপাত। এই স্বায়ত্তশাসনের অনবদ্য অভিব্যক্তি দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে। তিনি গড়ে তোলেন ছাত্রশাসনতন্ত্র, এই বিশেষ ব্যবস্থায় ছাত্ররা নিজেদের শাসনের ভার নিজেরাই নেয়। তারা অপরাধী সতীর্থকে ছাত্র সংগঠনের সামনে উপস্থিত করে ও তার বিচার করে। এই স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের পরিচালনার একটি ভূমিকা রয়েছে। ছাত্রপরিষদ সংগঠিত হয় ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজকর্মে, অনুষ্ঠানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব এই ছাত্র পরিষদের ওপর ন্যস্ত হয়। বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গুড (Good) বলেছেন, "It is the maintenance of order and the regulation of matters of conduct in school by

elected representatives chosen among the students themselves." অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যবস্থাকেই বিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বলা যায়।

এই স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার প্রকারভেদ রয়েছে। বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা নানাভাবে প্রবর্তন করা হয়। যেমন, অসংগঠিত স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা (informal type)। এই ব্যবস্থায় সাময়িক কর্মের ভিত্তিতে শিক্ষক তাঁর মনোমত শিক্ষার্থীদের ওপর কাজের দায়িত্ব দেন। অনেক সময় কাজের সুবিধার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে তাদের হাতে ওই সাময়িক কাজেব বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষক এই ধরনের সংগঠিত ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের দেখাশোনা করেন।

এই ধরনের স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থাকে বিশেষ কর্মভিত্তিক ব্যবস্থা specific service type বলা হয়। এই ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে সমাজসেবা, প্রাথমিক চিকিৎসা বা First Aid, এন. সি. সি., স্কাউটিং, এন্, এস্ এস্ প্রভৃতি সবই গণ্য করা হয়।

শিক্ষার্থী পরিষদ 'Students' Council বা 'Students' 'Union' বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা, 'খেলাধুলো', সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে সমস্ত শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে সদর্থকভাবে পরিচালনার দায়িত্বে থাকে। শিক্ষার্থী পরিষদ গঠিত হয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়—এক এক জনের নেতৃত্বে সমিতি, উপসমিতি গঠিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে এক একটি সমিতি বা Committee থাকে। অনেক সময় নীতি নির্ধারক একটি কমিটি থাকে, এই কমিটি অন্য সমস্ত উপসমিতিগুলির বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পর্কে দায়িত্বে থাকে। আবার আরও একটি কমিটি থাকে, যাকে বলা হয় কার্যনির্বাহক কমিটি। এছাড়া অর্থসংক্রান্ত বিষয়ের জন্য Finance Committee থাকে। তার একজন কোষাধ্যক্ষ বা Treasurer থাকে। সাধারণত এই ছাত্র সংসদের প্রতিটি বিভাগে শিক্ষক প্রতিনিধিও থাকেন। তাঁদের কাজ হল শিক্ষার্থীদের কাজগুলিকে উদ্দেশ্যমুখী করে তোলা ও সমস্ত প্রচেষ্টাগুলিকে সুসংহত বা Co-ordinate করা।

এই স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা নীতি অনুসারে বলে—এই নীতিগুলি হল গণতান্ত্রিক, সমাজসেবা, নান্দনিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, আত্মসচেতন হওয়া, সামাজিক চেতনাসম্পন্ন হওয়া। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমগ্র পরিবেশটিকে দূষণমুক্ত রাখাই এই স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য।

এই স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ বহুমুখী পরিণতি লাভে সমর্থ হয়। আত্মনির্ভরতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্যকে সুস্পষ্ট করে তোলে।শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার হয়। এই স্বায়ত্তশাসনের মূল মন্ত্রটি হল স্বাধীনতা। স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় শিক্ষক সহায়ক ও পরিদর্শক হবেন মাত্র। শিক্ষার্থীদের কাজে শিক্ষক প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করবেন না। শিক্ষার্থীরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে।

শিক্ষার্থীদেরও উপযুক্তভাবে সক্রিয় করে তুলে, তাদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত প্রেষণার (motivation) সঞ্চার করে শিক্ষক তাঁর সামাজিক দায়িত্ব পালন করবেন।

আজকাল মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক স্তরে ছাত্র প্রতিনিধিত্ব (Students' representation) একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা তারা নিজেরাই পেশ করছে ও তাদের মতামত গৃহীত হচ্ছে। তবে আজকালকার রাজনৈতিক দলগুলির দাপট ও প্রভাব অনেকক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষিত নয়। এই দলীয় রাজনীতি অনেক সময় রেষারেষি, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তৈরি করে। শিক্ষা পরিমণ্ডলকে এগুলি থেকে যথা সম্ভব মুক্ত রাখাই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষালয় একটি সমাজ, কিন্তু আদর্শায়িত, পবিত্রীকৃত সমাজ। বলিষ্ঠ সমাজ গঠন করতে গেলে আদর্শসম্পন্ন বলিষ্ঠ ব্যক্তিগঠন একান্ত প্রয়োজন। তাই স্বাধীন সেই যে আত্মনিয়ন্ত্রিত, অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব তার ওপরে দেওয়া যেতে পারে। আধুনিক শিক্ষার বাতাবরণ আজ সমগ্র বিশ্ব—যার মন্ত্র হল মৈত্রী, সহযোগিতা ও সংহতি। ছাত্র শাসনতন্ত্রের আদর্শ হোক এই মানবিক মূল্যবোধ।

প্রশ্নাবলী

১। শৃঙ্খলার প্রাচীন ধারণা কি ছিল? আধুনিক শিক্ষায় শৃঙ্খলা বলতে কী বোঝায়?

২। শৃঙ্খলার সঙ্গে অনুশাসনের (order) কী পার্থক্য?

৩। আত্মশৃঙ্খলা বা মুক্ত শৃঙ্খলা কাকে বলে? শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরনের শৃঙ্খলা কীভাবে প্রয়োগ করা যায়?

৪। শিক্ষা পরিবেশে শৃঙ্খলা রক্ষার উপায়গুলি কি কি?

৫। শিক্ষার্থী পরিষদ গঠনের নীতিগুলি উল্লেখ করো। শিক্ষার্থী পরিষদের কাজ কি?
(ক. বি. জেনারেল, ২০০২)

৬। **টীকা লেখ ঃ**

(ক) শৃঙ্খলার প্রাচীন ধারণা।

(খ) মুক্ত শৃঙ্খলা।

(গ) শিক্ষালয়ে স্বায়ত্ত শাসন। (ক. বি. জেনারেল, ২০০১)

(ঘ) অবদমনমূলক শৃঙ্খলা।

(ঙ) "পিনবিদ্ধ সারি সারি প্রজাপতি"—শৃঙ্খলার কোন্ অবস্থার প্রসঙ্গে কে বলেছিলেন?

(চ) রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে স্বায়ত্ত শাসনরে ক্ষেত্রে কি উপায় অবলম্বন করেছিলেন?

(ছ) বহির্জাত শৃঙ্খলা বলতে কি বোঝ? (ক. বি. জেনারেল, ২০০৪)

উনবিংশ অধ্যায়

মূল্যবোধ ও শিক্ষা

- মূল্যবোধ গড়ে তোলা শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ।
- মূল্যবোধ কাকে বলে।
- বিভিন্ন দার্শনিক মত ও মূল্যবোধ।
- শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় ও উপকরণ কেমন করে আকাঙ্খিত মূল্যবোধ গড়ে তোলে।

উনবিংশ অধ্যায়

মূল্যবোধ ও শিক্ষা (Value and Education)

"ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে; ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাদের প্রাণকোরকের গোপন মর্মস্থলে বিকাশ বেদনা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই; তাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষাপ্রসঙ্গে একথা লিখেছিলেন। এই যে গড়ে ওঠা, নানাভাবে নানা দিকে বিকশিত হওয়া ও পরিপূর্ণ হওয়া—এই হল শিক্ষার মূল্য, সেই মূল্য সম্পর্কে যে বোধ সৃষ্টি হয় তাই তো মূল্যবোধ। শিক্ষা আর মূল্যবোধকে তো আলাদা করা যায় না। শিক্ষা তো বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধের উৎস। শিক্ষার কাজও আবার মূল্যবোধের সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও গতিময় জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন নতুন মূল্যবোধ তৈরি করা, পাঠ্যক্রমের দ্বারা, পদ্ধতির অনুসরণে, শিক্ষকের সশ্রদ্ধ অবদানে, বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে।

নানা দিকে বিকশিত হয়ে ওঠাই শিক্ষার মূল্য

আজ একবিংশ শতক—নানা পরিবর্তনের জোয়ারে সভ্যতা, সংস্কৃতি ভাসমান। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি নানা উপহারে অলঙ্কৃত করছে মানুষের জীবনকে। তবু কি আমরা দেখতে পাচ্ছি উন্নত হয়েছে মূল্যবোধ, না অবক্ষয়িত মূল্যবোধের শিকার মানুষ? বিদ্যাচর্চা, শিক্ষা সম্প্রসারণ গড়ে তুলতে পারছে কি পূর্ণ মানুষ?

মূল্যবোধ কি গড়ে উঠছে?

গত শতকের ছয়ের দশকের গঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষাকমিশন (কোঠারী কমিশন) মন্তব্য করেছিল, *'at a time when the need to cultivate a sense of moral and social responsibilities in the rising generation is paramount, education does not emphasise character formation, and makes little or no effort to cultivate moral and spiritual values, particularly the interests, attitudes and values needed in a democratic and socialistic society.'* অর্থাৎ নতুন প্রজন্মে যখন নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব বোধের ধারণা গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন, তখন শিক্ষা চরিত্র গঠনের প্রতি একেবারেই জোর দিচ্ছে না, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ গঠনে, এমনকি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রাজ্যের পক্ষে উপযোগী যে সব আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যমান গড়ে তোলা দরকার, সেগুলির প্রতিও শিক্ষা পরিকল্পনা যথেষ্ট উদাসীন।

কোঠারী কমিশন— মূল্যবোধ গড়ে তোলার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না।

স্বাধীন ভারতে গঠিত প্রথম শিক্ষা কমিশন হল **রাধাকৃষ্ণণ কমিশন**। এটি উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত কমিশন হলেও এই কমিশনে ভারতীয় শিক্ষার একটি সার্বিক চিত্র পাওয়া যায়, আর বিভিন্ন শিক্ষামূলক সমস্যার সমাধানে মূল্যবান কিছু মন্তব্যও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানুষের জীবনে মূল্যবোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন, এই প্রসঙ্গে কমিশন বলছে, "When there is an empty space in the souls of men, superstitions fill the void. Belief in the absolute values seems to be a condition of life." অর্থাৎ, 'মানুষের মনের গভীরে যখন শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তখনই কুসংস্কার দানা বাঁধে। চিরন্তন মূল্যবোধে বিশ্বাস জীবনেরই অঙ্গ বিশেষ।' Pascal বলেছিলেন, মানুষ বিশ্বাস করতে ও ভালবাসতে চায়। কিন্তু বিশ্বাস করার ও ভালবাসার উপযুক্ত বিষয় বা বস্তু না পেলে সে অনুপযুক্ত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই মূল্যবোধ মানব জীবনের পূর্ণবিকাশের লক্ষ্যানুযায়ী হবে, দর্শন হবে তার দিশারী।

রাধাকৃষ্ণণ কমিশন

মনে শূন্যতা সৃষ্টি হলে বিকার গড়ে ওঠে

শিক্ষা কিভাবে মূল্যবোধ সঞ্চয় করতে ও নতুন নতুন মূল্যবোধ গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবে—তা সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করার আগে **'মূল্যবোধ'** শব্দটি বলতে আমরা কী বুঝি তা বলার দরকার আছে।

ভালবাসার বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ

'মূল্যবোধ' বা 'value' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল—**নির্বাচনের যোগ্যতা** (worthiness to be chosen), অর্থাৎ কোন্‌টিকে আমার জীবনে আমি প্রাধান্য দেব—বিদ্যাকে, না অর্থ সম্পত্তিকে, বা অন্য কিছুকে? জন ডিউই বললেন, 'to value means primarily to prize, to esteem, to appraise, to estimate' অর্থাৎ কাউকে বা কোনো কিছুকে মূল্য দেওয়া মানে তাকে প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া, অর্থাৎ অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করে তাকে বেছে নেওয়া এবং তার সম্পর্কে কোনো ইতিবাচক সিদ্ধান্তে আসা। মূল্যবোধগুলিকে মেনে নেওয়া হয়। এগুলির উৎস দার্শনিক চিন্তাভাবনা, বা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা বিভিন্ন পারিবেশিক অবস্থা, জীবন জগৎ সম্পর্কে ধারণা।

মূল্যবোধ কাকে বলে?

নির্বাচনের যোগ্যতা

মূল্যবোধের উৎস

বিভিন্ন দর্শনমত মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবনা চিন্তা ব্যক্ত করেছে। তাই দেশে, কালে, প্রজন্মে প্রজন্মে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মূল্যবোধও বিভিন্ন। **ভাববাদী দর্শন (Idealism)** মতে মূল্যবোধ **শাশ্বত, চিরন্তন, তাই শিক্ষার কাজ এই মূল্যবোধগুলির সংরক্ষণ ও প্রজন্মান্তরে সঞ্চালন। প্রকৃতিবাদী (Naturalist) ও বস্তুবাদী (materialist) দার্শনিক মনে করেন, যে মূল্যবোধ লুকিয়ে রয়েছে প্রকৃতি বা বস্তুর মধ্যে,** মানুষের কাজ হল তার বৌদ্ধিক ক্ষমতার মাধ্যমে ওইগুলি আবিষ্কার করা। **প্রয়োগবাদী (Pragmatist) ও অস্তিত্ববাদী (Existentialist)** দার্শনিকরা বলেন, **মূল্যবোধ ব্যক্তিভিত্তিক** অর্থাৎ subjective এবং পরিবর্তনশীল। নিত্য নতুন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। যে কাজ বা যে বস্তু মানুষকে সফলতা দেয়, তারই মূল্য রয়েছে বলে মনে করা হয়। মূল্যবোধই মানুষকে কর্মে ও বিষয় বা বস্তুনির্বাচনে প্রেরণা (motivation) জোগায়।

ভাববাদ ও মূল্যবোধ

বস্তুবাদ প্রকৃতিবাদ ও মূল্যবোধ

মূল্যবোধের বিভিন্ন ধরন রয়েছে, যেমন, ব্যক্তিভিত্তিক মূল্যবোধ, নৈর্ব্যক্তিক মূল্যবোধ। ব্যক্তিভিত্তিক বা Subjective। আবার বিষয় বা বস্তুকে মূল্য দেয়—সেই ধরনের মূল্যবোধ তা যে কোনো ব্যক্তিই পছন্দ করতে পারে—সেটির মূল্য নৈর্ব্যক্তিক (objective)। আবার কিছু কিছু বিষয় বা বস্তুর মূল্য **তাৎক্ষণিক,** অর্থাৎ তাদের দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হই, আমাদের নানা প্রয়োজন মিটে যায়। যেমন, অর্থনৈতিক মূল্যবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, শিক্ষাগত মূল্যবোধ ইত্যাদি। এখন **এই** সমস্ত ধরনের মূল্যবোধের পরিমাপক হল শিক্ষা, কারণ **শিক্ষাই** মানবিক চেতনা, বুদ্ধি, **কর্মক্ষমতা** ইত্যাদির প্রাণস্বরূপ।

অস্তিত্ববাদ প্রয়োগবাদ ও মূল্যবোধ

মূল্যবোধের ধরন ব্যক্তি ভিত্তিক

নৈর্ব্যক্তিক, তাৎক্ষণিক ও পারিবেশিক

এইবার আমাদের বক্তব্য হল—বিকাশমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে এইসব মূল্যবোধগুলিকে কেমন করে গড়ে তোলা যেতে পারে উপযুক্ত শিক্ষার পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে—সেই বিষয়ে। শিক্ষার মধ্যেই তো মূল্যবোধের মূল সুরটি গাঁথা, তাই শিক্ষার ভূমিকা এ বিষয়ে অগ্রগণ্য। কর্নেলিয়াস বলেছিলেন, **'মায়ের কোল'** (Mother's knee) **শিশুর প্রথম বিদ্যালয়।'** আরও সুন্দর প্রবচন আছে— 'the hand that rocks the cradle, rules the world'—অর্থাৎ, 'যে হাত শিশুর দোলনায় দোল দেয়, সেই **হাতই** শাসন চালায়'। এর অর্থ হল গৃহপরিবেশ একটি ব্যক্তির মূল কাঠামো তৈরি **করে দেয়।** গৃহপরিবেশ থেকে সে বিদ্যালয়ে আসে—সেই প্রাঙ্গণ তাকে আরও বৃহত্তর পরিধির সঙ্গে পরিচিত করে। **বিদ্যালয়** সমাজের আদর্শ সংস্করণ, সেখানে শিক্ষার্থীরা বিকশিত হয়ে ওঠে বিভিন্ন দিকে—শরীরে, মনে, বুদ্ধিতে, নৈতিকতায়, সমাজচেতনায়—কারণ শিক্ষা তার জীবনেরই অঙ্গ, আর শিক্ষাই মূল্যমান নির্দেশ করে। তাই শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় **পাঠক্রম, পদ্ধতি, শিক্ষকের ভূমিকা** ইত্যাদির মূল্য অপরিসীম।

কী উপায়ে মূল্যবোধ গড়ে তোলা যায়?

শিক্ষা—প্রথম পরিবেশ গৃহ

বিদ্যালয়

পাঠক্রম বা Curriculum শিক্ষা প্রক্রিয়ার আবশ্যিক উপকরণ। বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত করে শিক্ষার্থীকে। প্রথমেই ধরা যাক—মানবিকী বিষয়গুলি, যেমন ভাষা সাহিত্য। **ভাষা ও সাহিত্য** শুধু আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করে না, আমাদের চিত্তের অনুভব, উপলব্ধি, সৌন্দর্য চেতনারও জন্ম দেয়। **সমাজ-বিদ্যার** অন্তর্গত—**ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান** ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের সমাজসচেতন করে গড়ে তোলে। অঙ্কশাস্ত্র বুদ্ধিবৃত্তিকে তীক্ষ্ণ করে, পরিমিতি শেখায়। ফ্রয়েবেলের মতে, প্রকৃতির রাজ্য বড় রহস্যময় ও প্রতীকী (mystic and symbolic), একমাত্র **অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানই** পারে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে। তাই তিনি বললেন, 'God is the greatest mathematician x x x x mathematics is the greatest expression of the laws of life." **বিজ্ঞান** পাঠেরও অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ

পাঠক্রম কেমন করে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে?

ভাষা ও সাহিত্য

সমাজবিজ্ঞান

বৌদ্ধিক বিকাশ। জগৎ, বস্তুচেতনা, তার ক্রিয়াকলাপ, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মানুষকে তার বহির্জগৎ জানতে সাহায্য করে ও তার অন্তর্জগৎও পূর্ণ হয়ে ওঠে। **দর্শন** তো সমস্ত শাস্ত্রের জননী ও মূল্যবোধের দিশারী, তাই এর মূল্য অপরিমাপ্য। আজকের দিনে প্রযুক্তি শিক্ষার অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। **প্রযুক্তির** মাধ্যমে জ্ঞানের বিশ্বায়ন, গণশিক্ষা প্রসার, নানাবিধ বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে নিপুণতা, বুদ্ধি, নানা কৌশল, বিভিন্ন ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করছে। আজ জ্ঞান-বিস্ফোরণের (knowledge explosion) ক্ষেত্রে অগণন তথ্য রাশিকৃত হচ্ছে, একটি বিষয়ের বিভাজন হচ্ছে, ফলে খণ্ডজ্ঞান হয়তো পূর্ণবোধের পক্ষে সহায়ক হচ্ছে না, তাই সমন্বয় ধর্মটিকেও আজ পাঠ্যক্রম রচনায়, প্রযুক্তির ব্যবহারে ধরে রাখা আবশ্যক। নান্দনিক বিভিন্ন বিষয়, নাচগান, **শিল্পকলার** মূল্যমান তো বিশ্বজনীন। জাতীয় ঐক্য, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, মানবজীবনকে উন্নত করার প্রধান হাতিয়ার হল এই নান্দনিক বিষয়গুলি। **পাঠ্যক্রমিক কাজকর্ম, খেলাধুলা, নানা** সমাজ-সেবামূলক, **অবসর-বিনোদমূলক কাজ একটি** শিক্ষার্থীর তার দেহ, মন ও সমাজচেতনা গঠনে সহায়ক হবে। তাই পাঠ্যক্রম রচনার মৌলিক নীতি হবে কোন্ বিষয় কতখানি মূল্যমানের তা বিচার করা আর কোন্ বয়সের জন্য নির্ধারিত, তাও বিবেচনা করা। ব্যক্তিমূলক বৈষম্য, গণতান্ত্রিক আদর্শ, এই নীতিগুলি তো অবশ্যই অনুসরণীয়। এখন এই পাঠ্যক্রম মূল্যবোধের উজ্জীবনে কতখানি সফল হবে, তা নির্ভর করবে শিক্ষাদান পদ্ধতির ওপর। **শিক্ষাদান পদ্ধতি** অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্বনির্ভর হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীদের বিষয়টির সাঙ্গীকরণে সহায়ক পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে। শিশুদের জন্য খেলাভিত্তিক প্রণালী আর বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণীর জন্য আবিষ্কারমূলক, উদ্ভাবনধর্মী পদ্ধতি খুব কার্যকর। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিখবে ও এই **আত্মশিখনের দ্বারা জ্ঞানের মূল্য খুঁজে পাবে। প্রকৃত মূল্যবোধ সঞ্চয়নে ও বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা তো অমূল্য।** শিক্ষক তাঁর জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে শেখাবেন আদর্শ জীবনযাপনের মূল নীতিগুলি। তাই প্রাচীন ভারতের শিক্ষককে 'আচার্য' বলা হত—যিনি নিজের আচরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর জীবনটিকে গঠন করতেন।

অঙ্ক ও বিজ্ঞান

প্রযুক্তি

শিল্পকলা

কাজকর্ম

পদ্ধতি

জ্ঞানের মূল্য খুঁজে পাবে আত্মশিখনের দ্বারা

আজ শিক্ষা সম্প্রসারের মাধ্যম নানাবিধ—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশীর্বাদে সেগুলি থেকে প্রকৃত মূল্য-সম্পৃক্ত তথ্য, তত্ত্ব আহরণ করার মনোভাব গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষার, কারণ **শিক্ষার মূল নির্যাস (essence) তো মূল্যবোধ।** আমরা আশা করব, সমন্বয়ী পাঠ্যক্রম, কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি, শিক্ষকের উদার-মনস্কতা, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, সমাজচেতনা, মৈত্রী, পরমতসহিষ্ণুতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীন-মনস্কতা প্রভৃতি অমূল্য মূল্যবোধ **ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা, জাতিসত্তা, তার মানবসত্তাকে আজ ভুবনায়নের প্রাঙ্গণে পূর্ণতার** দিকে নিয়ে যাবে।

শিক্ষক

প্রশ্নাবলী

১। 'মূল্যবোধ ও শিক্ষা'—এ বিষয়ে একটি নিবন্ধ লেখ।
(ক. বি. অনার্স, ২০০১, ২০০৩, ২০০৪; বর্ধমান বি./বি.এড, ২০০২; রবীন্দ্রভারতী বি. এড, ২০০২)

২। মূল্যবোধের ধরন কি কি?

৩। মূল্যবোধের একটি সংজ্ঞা দাও। মূল্যবোধের বিভিন্নতার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে লেখ। তোমার মতে শিক্ষার মাধ্যমে কোন মূল্যাবোধমুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে এবং কেন?
(ক. বি./বি. এড. ২০০০, ২০০০, ২০০৪)

৪। **টীকা লেখ ঃ**
(ক) ভারতে মূল্যবোধ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। (বর্ধমান বি./এড. ২০০৩)
(খ) মূল্যবোধের সংজ্ঞা।
(গ) মূল্যবোধ ও শিক্ষার পাঠ্যক্রম।
(ঘ) মূল্যবোধ ও শিক্ষক।
(ঙ) মূল্যবোধ ও শিক্ষণ পদ্ধতি।
(চ) মূল্যবোধ ও বিদ্যালয়।

এক কিন্তু বহু, তার জন্মলগ্ন থেকে সে ভাষায়, ধর্মে, বর্ণে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে—তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সে ভৌগোলিক অবস্থানে, ঐতিহ্যে, সমন্বয়ী ধর্মে সে অতুলনীয়। অনন্যা প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে ভৌগোলিক অবস্থানে ভারত এক অখণ্ড অনন্য সৌন্দর্যে ভূষিত ছিল, সে মাতৃমূর্তি এখন আংশিক বিচ্ছিন্ন হলেও **প্রাকৃতিক নানা বৈচিত্র্যে আজও সে অনন্যা।** কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর গানে ভারতের যে অপূর্ব ছবি এঁকেছেন তা উদ্ধৃত করছি ঃ

"শীর্ষে তোমার তুষার কিরীট
সাগর ঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার
পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখনও মা তুমি ভীষণ দীপ্ত
তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্যে,
হাসিয়া কখনও শ্যামল শস্যে
ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।"

ভারতের ঐক্য তাই বিচিত্রমুখী, **বৈপরীত্যে সে সমন্বিত।** জাতীয় সংহতির মূল কেন্দ্র বৈপরীত্যে সমন্বিত তার আত্মিক জীবন বিন্দুটি হল আত্মিক জীবন, যা গড়ে তোলে একটি বিশেষ চেতনা। **ভারতের জাতীয় সংহতি** প্রসঙ্গে ১৯৪৮-৪৯ সালে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে গঠিত যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করেছিল, তাতে বিধৃত আছে একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য—*"National Unity and progress require a deeper foundation than political and economic arrangements. It is the life of spirit that has shaped and united our collective existence and has been the real bond of oneness among the Indian people".* **জাতীয় সংহতি মূলত একটি ভাবাদর্শ।** জাতীয় সংহতি মূলত একটি ভাবাদর্শ ঐক্যবোধ, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, প্রকৃত দেশাত্মবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমমনস্কতা জাতীয় সংহতির মূল উপাদান। একই সুনির্দিষ্ট সুসংহত জাতীয় চরিত্রের পরিমণ্ডলে জাতীয় সংহতি জন্মায়, জাতীয় ঐতিহ্যের গতিময় ও স্থায়ী রূপটিই জাতীয় চরিত্রে প্রকাশিত হয়। এই ঐতিহ্য **ও জাতীয়তাবাদী মূল্যবোধ মানসজগতে জাতীয় চরিত্রের পটভূমি তৈরি করে।** ভারতের জাতীয় চরিত্রে রয়েছে পরমত সহিষ্ণুতার, সহযোগিতার ও সহমর্মিতার আদর্শ। ভারত তার জন্মমুহূর্ত থেকেই এক থেকেই বহু হয়েছে, বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একই ছত্রছায়ায় মিলিত হয়েছে, সমন্বিত হয়েছে, তাদের বৈচিত্র্য নষ্ট হয়নি। এক হয়েছে, কিন্তু একাকার হয়ে যায়নি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে ভারতীয় জাতীয় চরিত্রে কতকগুলি অত্যন্ত মূল্যবান গুণ থাকা সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় সংহতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা

ভারতের জাতীয় ঐতিহ্য অত্যন্ত উচ্চমার্গের

অনেক সময়ে জাতীয় আদর্শ ক্রিয়াশীল থাকেনি

যায়, অধিকাংশ সময়ে জাতীয় আদর্শ ক্রিয়াশীল থাকেনি, সংহতি নিদারুণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে নানা পর্যায়ে। আর্যজাতি অনার্যজাতি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। মহাকাব্যের যুগে যুদ্ধবিগ্রহ তো নিত্যকার সঙ্গী ছিল, কখনও কখনও ধর্ম ও দর্শনের মিথ্যা প্রলেপ পড়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে বুদ্ধের আদর্শ অনুপ্রাণিত করেছে অনেক রাজা মহারাজাকে একত্ববোধের আদর্শে, অহিংসা ব্রতে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ভারত চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় বিভিন্ন রাজ্যে সংস্কৃতির লড়াই দেখা গেছে। ভারতের ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছে, **শক, পহ্লব, কুষাণ, হুন** প্রভৃতির আক্রমণ। কিন্তু এদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, কারণ, এদের কোনও ঐতিহ্যসম্পন্ন সংস্কৃতি ছিল না। তাই ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির মধ্যেই এরা বিলীন হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে সমস্ত দেশ জুড়ে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি এই দুই ধারা তাদের নিজস্ব গতিপথে প্রবহমান থেকেছে। **অষ্টম খ্রিস্টাব্দের** কাছাকাছি সময়ে দক্ষিণ ভারতের দার্শনিক শঙ্করাচার্য ও রামানুজ উত্তর ও দক্ষিণভারত, আর্য ও দ্রাবিড় জাতির মধ্যে ঐক্য নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। ভারত আরও ছোটো ছোটো আক্রমণের শিকার হয়েছে। **এসেছে মধ্যযুগ**—ইসলাম এল সম্পূর্ণ পৃথক ও প্রতিদ্বন্দ্বী ধারারূপে। ইসলাম রাজশক্তি এখানে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। রাজশক্তির আনুকূল্যে ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা সযত্নে লালিত হয়েছে। আবার কখনও সংঘর্ষ বেধেছে দুই ভাবধারার। মধ্যযুগে শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য নতুন মাত্রা খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা অবক্ষয়িত হওয়ার সুযোগে ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটেছে **ইউরোপীয় বণিক ও ধর্মযাজকদের, ব্যবসা, ধর্মপ্রচার এবং মূলত রাজ্যবিজয়ের** (commerce, conversion and conquest) **উদ্দেশ্যে এদের ভারতে আগমন।** 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে।' অষ্টাদশ শতকে ইংরেজরা তাদের ঔপনিবেশিক শাসন বলবৎ করল। **দীর্ঘ ২০০ বছর পর, জাতীয় স্তরে বিভিন্ন ধারায় আন্দোলনের ফল স্বরূপ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হল।** নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে সাম্য, স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিগুলিকে সামনে রেখে ভারত যাত্রা শুরু করল নতুন পথে। কিন্তু আজ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দীর্ঘ ৫৮ বছর পরেও সংহতিরূপ আদর্শ দূরে থাকুক, ক্রমশ ভারত বিচ্ছিন্নতার, বিভেদের এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কখনও ধর্মের ভিত্তিতে, কখনও আঞ্চলিকতার বিভিন্নতায়, কোথাও রাজনৈতিক মতবিরোধে ভারতের মানুষ আত্মহননে লিপ্ত। ভালবাসার বাণী, সহনশীলতার আদর্শ, ভ্রাতৃত্বের মহিমা স্মরণযোগ্য, কিন্তু 'ব্যর্থ নমস্কারে' তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঐ জাতীয় সংহতির অভাব শুধু ভারতীয় জাতীয় প্রেক্ষাপটে সত্য নয়, এই অসংহতি একটি সার্বিক চিত্র। এই সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সেই ব্রত পালনে শিক্ষার ভূমিকা কী হওয়া উচিত, তা আলোচনা করে দেখা যাক।

স্বাধীন ভারত গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে যাত্রা শুরু করল

ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করে একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মন্তব্য

করেছিলেন, *'Our education has done far less for Indian culture than for material and political progress of India. She looks to our schools and colleges for equipment in the struggle for existence, for the secret of happy living. Vivendi Causae. She looks elsewhere''*—অর্থাৎ "আমাদের (ইংরাজী) শিক্ষা ভারতীয় সংস্কৃতির থেকে অনেক বেশি নজর দিয়েছে তার রাজনৈতিক ও বস্তুমূলক উন্নতির দিকে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাকে আমাদের স্কুল-কলেজের ওপর নির্ভর করতে হয়, কিন্তু শান্তির উৎস সন্ধান সে করে অন্যত্র।" ঔপনিবেশিক শিক্ষার যে পতন হয়েছিল সেই অষ্টাদশ শতকে—তার ধারাবাহিকতা আজও প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে। শুধু 'নতুন পাত্রে পুরনো সুরা বিতরণ'-এর (old wine in a new bottle) মত ঔপনিবেশিক ধরনে ভারতীয় আদর্শ পরিবেশনের ব্যর্থ প্রয়াস চলছে। শান্তিপূর্ণ জীবনের যে মূল উৎসভূমি, যার বিহার ভারতের তপোবনে, তার সামগানে, তার উপকরণ বাহুল্যবর্জিত জীবন যাপনে—সে সত্য অনুদ্‌ঘাটিত। ব্যক্তির ও সমাজের জন্য প্রয়োজন কৃষ্টির। সেই কৃষ্টির প্রধান প্রধান চিহ্নগুলি হল—বৌদ্ধিক সচেতনতা, সৌন্দর্যপ্রীতি, মানবিক অনুভূতি ও সামাজিক প্রেরণা। আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় কৃষ্টির কোনো চিহ্নই বর্তমান নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাতীয় শিক্ষা' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, "আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে। আমরা যাহা হইতে পারি, তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব, ইহাই শিক্ষার ফল।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষামূলক নানা রচনায় লিখেছেন,—'ভারতের জাতীয় শিক্ষা একেবারেই স্বতন্ত্র। ভারতের শিক্ষার আদর্শকে তার নিজের সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী ও কর্মে যোগসাধনা।'

ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণে ব্যর্থতা

ঔপনিবেশিক শিক্ষা

কৃষ্টির প্রধান চিহ্ন

স্বাধীন ভারতে নানা শিক্ষা কমিশন ও কমিটি শিক্ষার স্বরূপ পর্যালোচনা করেছে ও শিক্ষা পরিকল্পনায় তাদের সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, ১৯৫২-৫৩ সালের মুদালিয়ার কমিশন, ১৯৬৪-৬৬ সালের কোঠারী কমিশন, রিপোর্ট, ১৯৮০ সালের নতুন শিক্ষানীতি সংক্রান্ত কমিশন, তার পরবর্তীকালে রামমূর্তি কমিটি, রেড্ডি কমিটি ইত্যাদি জাতীয় সংহতির জন্য শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন, একই ভাষা ব্যবহার, এক ধরনের পাঠ্যক্রম পরিবেশন ও বিভিন্নমুখী জাতীয় পাঠ্যক্রমিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতি তুলে ধরা যায় এবং এগুলিই জাতীয় সংহতির লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায় বলে নির্ধারিত হয়েছে। ১৯৬৮ সালের জাতীয় সংহতি পর্ষৎ অর্থাৎ National Integration Council ভারতীয় জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মূল্যবোধের উল্লেখ করেছে—সেগুলি হল—সমান নাগরিকত্ব, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজসচেতনতা, ন্যায়,

বিভিন্ন কমিশন, কমিটি ও তাদের প্রচেষ্টা

National Integration Council 1968

স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্ব। এই গজেন্দ্রগদ্‌কর কমিটি শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় চেতনা উন্মেষের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করেছে। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য কয়েকটি বিশেষ পরামর্শ দিয়েছে, সেগুলি হল—**Text** বই লেখার জন্য একটি জাতীয় বোর্ড প্রতিষ্ঠা, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে সকল রকমের বৈষম্য নির্বিশেষে প্রকৃত শিক্ষা বিতরণ, সকলের জন্য সমান বিদ্যালয় প্রথা (**Common school system**) চালু করা, সমাজে অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের শিক্ষায় উৎসাহ-ব্যঞ্জক বৃত্তির প্রবর্তন, আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় (**Inter university system**) প্রথার মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ভাল বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে তোলা। পরবর্তীকালে সম্পূর্ণানন্দ কমিটি নামে জাতীয় সংহতির লক্ষ্যে আর একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটিও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিল, যেমন জাতীয় কর্মসূচী প্রকল্প গড়ে তোলা, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে জাতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সাহিত্যমূলক কাজকর্ম ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা, বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পকে আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত করা ইত্যাদি। এই সব কমিটির নির্দেশ অনুসারে **N.C.E.R.T.** প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেন্দ্রে ও রাজ্যস্তরে **S.C.E.R.T.**-রও জন্ম হয়েছে। জাতীয় পুস্তক পর্ষৎ অর্থাৎ **National Book Trust** গড়ে উঠেছে। জাতীয় স্তরে সভা সমিতি আলোচনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানোর প্রচেষ্টাও চলছে।

বিশেষ পরামর্শ

সম্পূর্ণানন্দ কমিটি

১৯৮০ সালের শিক্ষানীতি জাতীয় শিক্ষামূলক নানা নির্দেশ সামনে রেখেছে। সেগুলি হল—নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষাকে সার্বজনীন করা, মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করে তোলা, সমস্ত স্তরে প্রথা-বহির্ভূত (**Non-formal education**) শিক্ষা প্রচলন, সমস্ত বৈষম্যনির্বিশেষে মেধাবী তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য নবোদয় বিদ্যালয় গড়ে তোলা, ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ছাত্র-শিক্ষক বিনিময় প্রথা প্রবর্তন ইত্যাদি। এই শিক্ষানীতি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণের ওপর জোর দিয়েছে। আর এই নীতি অনুসরণে দূর শিক্ষা প্রকল্প (Distance Education), পরিবার পরিকল্পনামূলক শিক্ষা (Population Education) ইত্যাদির দ্বারা জনসাধারণ শিক্ষিত হবে ও উদ্বুদ্ধ হবে জাতীয় চেতনায়।

১৯৮০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি

এতক্ষণ জাতীয় সংহতি রক্ষায় জাতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক নানা পরিকল্পনা আলোচিত হল। এখন বিদ্যালয়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে আসা যাক। জাতীয় ঐক্যগঠনে শিক্ষালয়গুলির, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ভূমিকা খুবই সদর্থক হতে পারে যদি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিক শিশু ও তরুণ-তরুণীর সামনে পরিবেশিত হয় পাঠ্যক্রম ও নানা ক্রিয়াকরণের মধ্য দিয়ে। জাতীয় ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প সাহিত্য, প্রাচীন বিজ্ঞান ইত্যাদি পাঠ্যক্রমে এমনভাবে বিন্যস্ত করা উচিত যাতে শিক্ষার্থী সহজেই সেগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। আরও নানা অনুষ্ঠান পালন, যেমন, স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন, জাতীয় নেতা

পাঠ্যক্রম

ও মনীষীবৃন্দের জীবনীপাঠ ও তাঁদের জন্মদিন পালন, জাতীয় সঙ্গীত শেখানো, জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান, ইত্যাদি বিকাশমান ব্যক্তিত্বে তার জাতি সম্পর্কে একটি বোধ তৈরি করতে সমর্থ হবে। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে পরিচিতি এই লক্ষ্য সফল করতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল—প্রত্যেকটি ব্যক্তির প্রাক্ষোভিক সাম্যরক্ষা করা (emotional balance)। অসংহতির জন্ম তো ব্যক্তির ভেতরে—তারই বহিঃপ্রকাশ তার গৃহে, সমাজে, জাতিতে। কারণ অসংহত চিত্ত শান্তি ও সংহতির পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে না। তাই শিক্ষা প্রক্রিয়ার দিশারী যেমন দর্শন, তেমনি সহচারী বন্ধু হবে মনস্তত্ত্ব। শিক্ষার্থীদের মানসিক গঠনের জন্য মনোবিজ্ঞান অপরিহার্য। **বিভিন্ন শিক্ষা মাধ্যম যেমন, T.V., Radio, সংবাদপত্র, সিনেমা ইত্যাদির মুখ্য উদ্দেশ্য হবে জাতীয় সংহতি গড়ে তোলা,** তার লক্ষ্য হল সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নয়, বিশ্বমানবতা, যা পূর্ণ করবে মানুষকে মনুষ্যত্বে, অখণ্ড ঐক্যতত্ত্বে। গুজরাট, জম্মু কাশ্মীর আরও নানা ছোট ছোট অঞ্চলে মানুষের দ্বারা মানুষের যে পীড়ন চলছে, তা প্রশাসনের দ্বারা সম্পূর্ণ বন্ধ হবার নয়। এর জন্য প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতির, মানবিক মূল্যবোধ, প্রাক্ষোভিক সংহতি, সামাজিক চেতনা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের উপলব্ধি।

শিক্ষার মাধ্যম

ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য মুক্তি, সেই মুক্তি মনের, জ্ঞানের, নানা কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্তি। সেই মুমুক্ষা জন্ম দেয় শুভ বুদ্ধির, যোগসাধনার, আত্মপ্রত্যয়ের। তাই ভারতের প্রার্থনা— **স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু**—অর্থাৎ তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত করুন। ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিকতাকে ঘিরে যে বৈষম্য তা দূর হোক। নতুন সূর্যের অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করি আমরা।

প্রশ্নাবলী

১। জাতীয় সংহতি কাকে বলে? জাতীয় সংহতির গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করো। এর বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা উল্লেখ কর।

(ক. বি. অনার্স, ২০০৩; বর্ধমান বি./ বি. এড. ২০০২)

২। **টীকা লেখ ঃ**

(ক) শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় সংহতির বিকাশ।

(ক. বি. অনার্স, ২০০৪; বর্ধমান বি./ বি. এড. ২০০৩)

(খ) জাতীয় সংহতি ও গণতান্ত্রিক সচেতনতার জন্য শিক্ষার পুনর্বিন্যাস।

(বর্দ্ধমান বি/ বি. এড. ২০০১)

(গ) জাতীয় সংহতি ও শিক্ষা।

(ঘ) জাতীয় সংহতি ও শিক্ষক।

(ঙ) জাতীয় সংহতি ও পাঠ্যক্রম।

(চ) জাতীয় সংহতি ও শিক্ষণ পদ্ধতি।

(ছ) জাতীয় সংহতি ও বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়।

একবিংশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও শিক্ষা

- আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির অভাব একটি সমস্যা।
- শিক্ষা কেমনভাবে এই সমস্যা সমাধান করবে—সে সম্পর্কিত আলোচনা।

একবিংশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও শিক্ষা (International Understanding and Education)

একবিংশ শতক! নানা সম্ভার আজ মানুষের সামনে। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, শিল্পোন্নয়নে, শিক্ষার বিভিন্ন নিত্য নতুন উদ্ভাবনে, তথ্য সমৃদ্ধিতে, ব্যক্তিমানুষ, গোষ্ঠীমানুষ আজ ধনী! বাইরের উপকরণ তাকে সম্পদে, সম্ভোগে, ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধিতে ভুলিয়ে রেখেছে। কিন্তু মাঝেমাঝেই নিরাপত্তাহীনতার আতঙ্কে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে সে। বাতাসে বারুদের গন্ধ। ধর্মোন্মত্ততা, সর্ববিধ্বংসী সন্ত্রাসবাদ মানুষের রূপেই মানবসভ্যতাকে সম্মুখীন করিয়েছে বুঝি বা অবলুপ্তির পথে। কোনো শুভবোধ, সম্প্রীতির ইচ্ছা, মহামনীষীবৃন্দের রেখে যাওয়া জীবন নির্যাস মানুষকে তুলতে পারছে না হিংসা থেকে, আত্মহনন থেকে, ধর্মান্ধতা থেকে, সন্ত্রাসী মনোভাব থেকে। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা, ১৩ই ডিসেম্বর, ভারতের গণতন্ত্রহত্যার ষড়যন্ত্র, ইরাক-ইরান সংঘর্ষ মানুষের ইচ্ছার ফসল, আর তা মানুষেরই লজ্জার কারণ। ক্রমশ মানুষ একা হয়ে পড়ছে, কারণ সামাজিক নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আর সে নেই। কে আশ্বস্ত করবে দুঃস্থ মানুষকে? কে বলবে, 'সবার ওপরে মানুষ সত্য?' কোন্ কবি বলবেন, 'অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।' আর্তমানুষের কোন্ পরিত্রাতা বলবেন, 'Love thy neighbour! **Comenius** ১৬৪৩ সালে, আজ থেকে প্রায়ে সাড়ে তিনশো বছর আগে উপলব্ধি করেছিলেন যে সত্য, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি বললেন, "There is needed even today an immediate remedy from the frenzy which has seized many men and is driving them in their madness to their mutual destruction. For we witness throughout the world disastrous and destructive flames and discords devastating kingdoms and peoples with such persistence that all men seem to have conspired for their mutual ruin which will end only with the destruction of themselves and the universe. Nothing is, therefore, more necessary for the stability of the world, if it is not to perish completely, than some universal rededication of minds, universal peace and harmony must be secured for the whole human race. By peace and harmony, however, I mean not external peace between rulers and peoples among themselves but an internal peace of minds inspired by a system of ideas and feelings. If this could be attained the human race has a passion of great promise." সংক্ষিপ্তাকারে এই বক্তব্যের নির্যাস হল—"মানুষ যেন ষড়যন্ত্র করেছে আত্মহননের। সর্ববিধ্বংসী হিংসার আগুন চারিদিকে। মনে হচ্ছে

আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি বিপন্ন

Comenius

মানবসভ্যতা বুঝি অবলুপ্তির পথে। এর থেকে পরিত্রাণের পথ হল শান্তি ও সম্প্রীতির লক্ষ্যে মানুষের মানসিক অবদান। শান্তি, সংহতি বাইরের জিনিস নয়, এগুলির স্থান অন্তরে, প্রকৃত শান্তি গড়ে ওঠে বোধে, উপলব্ধিতে, কিছু ধ্যানধারণার সংগঠনে। তখনই বিশ্ব মানব জাতির সম্পদ উদ্‌ঘাটিত হবে।"

আন্তর্জাতিকতা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়—জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা কি পরস্পরবিরোধী, না পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে আসবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে সুচিন্তিত মতাদর্শ। জাতীয়তাবাদ যেমন শিক্ষা, সংস্কৃতির ফসল, তেমনি আন্তর্জাতিকতার জন্মও মানুষের ধ্যানধারণা ভাবনার, মননের জগতের ওপর ভিত্তি করে। এ বিষয়ে একটু অনুধাবন করলেই দেখা যায় যে মানুষের মন কিন্তু অবিভাজ্য এবং অখণ্ড। মানুষের সত্তার একটা দিক যেমন তার ব্যক্তিজীবন, আর একটা দিক সমাজ জীবন, ঠিক তেমনি মানুষের সত্তার একদিককে বলতে পারি তার জাতীয় সত্তা, অন্য দিককে বলতে পারি তার মানবিক সত্তা। ব্যক্তিজীবনে, মানুষের এক পরিচয়, সমাজ জীবনে সেই মানুষেরই অন্যতর পরিচয়। এই দুই পরিচয়ে কোনো বিরোধ নেই। জাতীয় শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে সেই সত্যটিকে তুলে ধরলেন যে ভারতীয়ের পক্ষে সেই শিক্ষাই যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা যা একই সঙ্গে তাকে ভারতীয় করে ও মানুষ করে। তিনি বললেন যে জাতীয় শিক্ষা দোষাবহ নয়, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু অসম্পূর্ণ। আন্তর্জাতিক বা সার্বভৌম শিক্ষা তার পরিপূরক। শিক্ষার মাধ্যমে বহু জাতির মিলনের ক্ষেত্রটি রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত করলেন, আর সেই আদর্শে নামাঙ্কিত হল "বিশ্বভারতী"—"যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্।" সমস্ত বিশ্ববিদ্যা এখানে এসে মিলিত হবে—তাই বিশ্বভারতীর লক্ষ্য। তিনি বললেন, "The feeling that Santiniketan should be placed above and beyond all geographical limitations, has been long in my mind : The victory banner of universal man will be unfurled there. To break through the python coils of nationalistic snobbery shall be the work of my last years....... On the high-way of the Man-god we shall be singing the song of super manhood. The road of that great world we shall consider as our country." এই বক্তব্যের নির্যাস হল—সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ থেকে মুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক মানুষটি বেরিয়ে আসবে। শান্তিনিকেতনে সেই ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করাই ছিল কবির শেষজীবনের লক্ষ্য।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা

বিশ্বভারতী

এখন ব্যাখ্যা করা যাক আন্তর্জাতিকতা বলতে কী বুঝি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার কীভাবে এই মহান আদর্শকে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারে। আজকের মানবজীবনের নিরাপত্তাহীনতার প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার মত জরুরী বিষয় বুঝি আর কিছু নেই।

আন্তর্জাতিকতা গড়ে ওঠার উপাদানগুলি হল—বিশ্ব নাগরিকত্ব, বিশ্ব সামাজিকতা, বিশ্ব শান্তি, বিশ্ববোধ, বিশ্ব সংস্কৃতি। ব্যক্তিমানুষ যখন নিজের সংকীর্ণ স্বার্থবোধ বিসর্জন

দিয়ে ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে সমস্ত মানুষের জন্য সমধর্মী হবে, সহযোগী হবে, সহানুভূতিশীল হবে তখনই আন্তর্জাতিকতা প্রকৃত অর্থে গড়ে উঠবে। বিশ্বটি হবে যেন একটি মানুষের পরিবার, বিশ্বের সঙ্গে তার একাত্মবোধ জন্মাবে। আজকে 'বিশ্বায়ন', 'ভুবনায়ন' ইত্যাদি গালভরা শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে বিশ্বজুড়ে, কিন্তু বিশ্বমৈত্রী কি এসেছে মানুষের মনে? মানব জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে, নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কালান্তক ব্যাধি, দারিদ্র্য, এবং সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি থেকে মানুষকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে নতুন প্রজন্মের মনে শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শ ও সেই আদর্শের প্রতিফলন আবশ্যিক ব্যবহারিক জীবনে।

আন্তর্জাতিকতা কাকে বলে?

মানব সমাজ সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনায় ধরা পড়ে বিংশ শতকের প্রথম পর্যায়েই দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ সমস্ত পরিবেশকে কিভাবে কলুষিত করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর মনীষিরা মিলিত হয়েছেন, তাঁদের সকলের মতবিনিময়ের ফসল—**'League of Nations'**। League of Nations পারেনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল গ্রাস থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করতে। তাই ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্বত্রাণের উপায় হিসাবে জন্ম নিল U.N.O. যার কাজ যুদ্ধ নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠা। অজ্ঞতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি কলুষতা থেকে মানুষকে শান্তি, প্রেম, মৈত্রী, সহযোগিতার পথে উত্তরণের সোপানে প্রতিষ্ঠিত করবার শপথ নিয়ে U.N.O. তার যাত্রা শুরু করল। ক্রমে U. N. O. -র শাখা সংগঠন গড়ে উঠল, যেমন, **UNESCO, UNICEF, FAO, WHO, CARE** ইত্যাদি, মানুষের মঙ্গল, শান্তি, মৈত্রীর পথে এগিয়ে চলল এরা। UNESCO-র প্রস্তাবনায় উদ্ধৃত আছে—"Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that edifice of peace must be constructed—the wide diffusion of culture, and the education for humanity, for justice, liberty and peace are indispensable for the dignity of man and constitute a sacred duty which all the nations must fulfil in a spirit of mutual assistance and concern." অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু হয় মানুষের মনে, তাই মানুষের মনেই শান্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে হবে। সংস্কৃতির বিস্তার, মানবিকতা, ন্যায়, স্বাধীনতা ও শান্তির শিক্ষা মানুষের মর্যাদার পক্ষে আবশ্যিক এবং সমস্ত জাতিগুলির কর্তব্য পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়ে এই শান্তি রক্ষার দায়িত্ব পবিত্র কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করা।

দুটি বিশ্বযুদ্ধ

League of Nations U.N.O.

মোট কথা, আন্তর্জাতিক মৈত্রী, শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে যেটি সবচেয়ে প্রয়োজন তা হল মানুষের মনের উত্তরণ—সংকীর্ণতা থেকে, স্বার্থ থেকে, বিজয়লিপ্সা থেকে, কুসংস্কার থেকে। মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে—পারমাণবিক শক্তির থেকে অনেক বড় শক্তি ঐক্যবোধের, বিশ্বমানবিকতার। উন্নত দেশ, উন্নয়নশীল দেশ সকলে এক হয়ে যদি পরস্পরের সহযোগী হয়ে ওঠে, যদি সহানুভূতিশীল হয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ব্রতী হয়, তবে সে শক্তি অকল্পনীয়। শিক্ষার কাজ হল সেই প্রচেষ্টার দিকে, সেই মানসিকতা গঠনে

সকলকে উদ্যোগী করা। এই প্রসঙ্গে **UNESCO**-র প্রস্তাবিত কিছু **কর্মপ্রকল্প উল্লেখ্য :** (ক) জাতীয় স্তরে সভা, সমিতি, আলোচনাচক্র গড়ে তোলা, (খ) বিভিন্ন জাতিকে তাদের শিক্ষা পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সহায়তা করা, (গ) বিনামূল্যে সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তার, (ঘ) মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প গড়ে তোলা, (ঙ) সকলের জন্য লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করা, (চ) নবসাক্ষরদের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, (ছ) ছাত্র-শিক্ষক বিনিময়প্রথা প্রবর্তন, (জ) মেধাবী যুবক-যুবতীদের আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন প্রকল্পে যোগদানের জন্য দেশ বিদেশে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে অনুদান প্রদান। এছাড়াও আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক সাংস্কৃতিক কাজকর্ম, পড়াশোনা, আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত।

UNESCO-র প্রস্তাব

এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক **শিক্ষা প্রক্রিয়া কেমন করে আন্তর্জাতিকতার রক্ষে নতুন প্রজন্মকে আলোকিত করবে।** শিক্ষার প্রধান উপাদান শিক্ষার্থী—তার শৈশব, বলা, যৌবনারম্ভ থেকে আরও কয়েকটি বছর কেটে যায় বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষা প্রক্রিয়ায় তাই শিক্ষার্থীর মানসিকতাকে কেন্দ্র করে নানা পাঠ্যক্রম যেমন, বিভিন্ন ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, গণিত, নানা নান্দনিক বিষয়গুলিকে বিন্যস্ত করতে হবে এমনভাবে যে বাল্যেই শিক্ষার্থীদের মনে গাঁথা হয়ে যায় এই সত্য যে বিশ্বসভ্যতা বা বিশ্ব ঐতিহ্যে সকল জাতিরই অবদান রয়েছে। বিভিন্নতার মধ্য দিয়েই বিশ্বায়ন সম্ভব হয়েছে। আজকের শিক্ষাজগতে শিক্ষার ভার শুধু বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা সংস্থা (Non-formal educational agencies) গড়ে উঠেছে চারিদিকে। T.V., Internet ইত্যাদি আধুনিকতম শিক্ষামাধ্যমের কাজ হবে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ঐক্যের মনোভাব গড়ে তোলা। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতাবিরোধী অশুভ ভাবনা যেমন, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতা, আঞ্চলিক বৈষম্যবোধ, ধর্মান্ধতা, জাতিভেদ প্রথা, কুসংস্কার, মহংসর্বস্বতা, উগ্র জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচার করতে হবে। প্রথাগত পাঠ্যক্রমের সঙ্গে এগুলির সংযোগসাধন খুবই ফলদায়ক। দূর শিক্ষা প্রকল্প (Distance Education), জনশিক্ষা কর্মসূচী (Population Education), সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন প্রকল্প, বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী ইত্যাদি ব্যক্তি মানুষ ও সামাজিক মানুষকে সচেতন ক'রে তোলে। সুস্থ জাতীয় ঐক্যবোধ আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে। বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক বর্ষ উদ্‌যাপনেরও যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। বিশেষ করে, রাষ্ট্রপুঞ্জ দিবস (U.N.O. Day) পালন, মানব অধিকার দিবস (Human Rights Day) পালন, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস (World Health Day) পালন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা যায়।

শিক্ষা সংস্থা

আন্তর্জাতিক দিবস পালন

পাঠ্যক্রমের পরে যে উপাদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা হল **পদ্ধতি**—শেখানোর পদ্ধতি এমন হবে, যা শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা গড়ে তুলবে। সে যখন নিজেই

পাঠ্যক্রমের বিন্যাস

শিক্ষার কাজ কী?

জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কিত মূল্যবোধে সম্পৃক্ত হবে নানা পাঠক্রমিক উপকরণের সূত্রে এবং জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে সেই শিক্ষা প্রয়োগ করবে, তখনই ওই বিদ্যা অবিদ্যার, অজ্ঞানের, বিচ্ছিন্নতার, কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে আলোর পথে, জ্ঞানের পথে নিয়ে যাবে। পাঠক্রমটি পরিবেশনের ভার **শিক্ষকের** ওপর। তাই শিক্ষককে বিশ্ব-মনোভাবাপন্ন হতে হবে। তিনিই তো শিক্ষার্থীর পরিবেশের নিয়ামক। তাই তাঁর মধ্যে আবশ্যিক গুণ হিসাবে শুধু বিদ্যার ঐশ্বর্য নয়, থাকতে হবে সুস্থ সমাজবোধ, সুস্থ চিন্তার ক্ষমতা, সংহত আবেগ, বিশ্লেষণমূলক চিন্তা-ভাবনার প্রবণতা, সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনকে সমন্বিত করার মনোভাব এবং সর্বোপরি সেবাপরায়ণতা ও শুভবুদ্ধি, যা প্রসারিত হবে, নমনীয় হবে নতুন ভাবনা গ্রহণের জন্য। শিক্ষকের জীবন শিক্ষার্থীর কাছে আদর্শস্বরূপ, তাঁরা দুজনে যৌথ দায়িত্ব পালন করবেন বিতরণের ও গ্রহণের—শুভ চিন্তার, সংযুক্তির ও বিশ্বমানবতাবোধের।

পদ্ধতি

শিক্ষকের গুণাবলী

বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পাঠ্যক্রম পরিবেশনে, পদ্ধতি পরিচালনায় শিক্ষককে সুস্থ, অনুকূল আবহাওয়া বজায় রাখতে সহায়তা করবে। প্রাচীন ভারতে তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে গড়ে উঠেছিল। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সেই যোগ্যতা অর্জনের দাবী রাখে।

শিক্ষার অর্থ অভিযোজন

আন্তর্জাতিক স্তরে সমস্ত শুভ শক্তিসম্পন্ন মানুষ সুস্থ জাতীয় চেতনা ও মঙ্গলজনক আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর—তা সম্ভব শিক্ষার মিলনের মাধ্যমে। শিক্ষার একটি অর্থই হল সার্থক অভিযোজন প্রক্রিয়া নিত্য নতুন পরিবেশের সঙ্গে, শিক্ষার লক্ষ্য সংযুক্তিকরণ। ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবারের, পরিবারের সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে জাতির, জাতির সঙ্গে নানা জাতির মিলনের সূত্রে বিশ্বসমাজের সঙ্গে যোগসাধনাই আজকের মন্ত্র। বিশ্বমানবের তীর্থক্ষেত্র হল মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন। নানা নদী যেমন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সাগরে মেশে—তেমনি প্রতি জাতি তার বিশিষ্টতা নিয়েই বাঁচবে, সংরক্ষিত হবে বিশ্ব-মানব সমাজে। আজকে মানবসভ্যতার দারুণ দুর্দিনেও আশা করতে ক্ষতি কি—শীত এলে, মধুমাস কি খুব দূরে? বিশ্বায়ন সার্থক হবে বিশ্ব-মানবের অস্তিত্ব ঘোষণায়।

প্রশ্নাবলী

১। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি বলতে কী বোঝ? শিক্ষার দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি কেমন করে গড়ে তোলা যায়, তা আলোচনা কর।

২। **টীকা লেখ :**

(ক) আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও শিক্ষার লক্ষ্য। (খ) আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও শিক্ষার পাঠ্যক্রম। (গ) আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও শিক্ষণ পদ্ধতি। (ঘ) আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও শিক্ষকের ভূমিকা। (ঙ) আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও বিদ্যালয়। (চ) জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকার সম্পর্ক।

বিভাগ (খ)

মহান শিক্ষাবিদদের শিক্ষায় অবদান

প্রতীচ্য শিক্ষাবিদ	প্রাচ্য শিক্ষাবিদ
(১) রুশো	(১) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(২) পেস্তালৎসি	(২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৩) ফ্রয়েবেল	(৩) স্বামী বিবেকানন্দ
(৪) জন ডিউই	(৪) মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
(৫) মাদাম মন্টেসরী	(৫) শ্রী অরবিন্দ

শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন
(Education and Human Resource Development)

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও শিক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। শিক্ষা প্রক্রিয়া ছাড়া যেমন মানব সম্পদ উন্নয়নের কথা ভাবাই যায় না, তেমনি, মানব সম্পদ উন্নীত না হলে শিক্ষা তার কোনও অর্থ খুঁজে পায় না। মানব সম্পদের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মানুষের অনন্ত সম্পদ বা গুণাবলী রয়েছে—শারীরিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈল্পিক, নান্দনিক, আত্মিক ইত্যাদি। শিক্ষার কাজ হল এগুলি উন্মোচন করা ও যথাযথ শিক্ষা প্রণালীর মধ্য দিয়ে এগুলির বিকাশ সাধন করা। মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তি তো জীবনে সফল হয়ই, উপরন্তু তার সমাজও উন্নীত হয়। ব্যক্তি ও সমাজ তো পরস্পর নির্ভরশীল উপাদান—যাদের মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সমাজ ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলে। তাই ব্যক্তি উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতির গোড়ার কথা হল মানব সম্পদ উন্নয়ন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই 'মানব-জমিন' পতিতই থেকে যায়। সাধক কবির কণ্ঠে এমনই পরিতাপ শোনা গিয়েছিল সেই অষ্টাদশ শতকে: *'এমন মানব-জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা'।* তাই প্রাচ্য পাশ্চাত্যে সর্বত্র শিক্ষাবিদদের মুখ্য বক্তব্য হল—মানুষ তৈরি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ১৯৮০ সালে Klee বললেন, মানুষের পক্ষে উপযোগী বা কার্যকরী সমস্ত বস্তু বা প্রাণশক্তিকেই সম্পদ বলা হয় ("all forms of matter or energy considered useful or essential by man")। শিক্ষায় অর্থনীতি বা Economics of Education মানুষকে **Capital** বা মূলধন হিসেবে গ্রহণ করেছে। পশ্চিম প্রান্তে এই মানবশক্তি উন্নয়নে অর্থ নিয়োগের ফলেই সে সব অঞ্চলে এত অর্থনৈতিক উন্নতি।

অনেকে মনে করেন মানুষকে মূলধন (Capital) হিসেবে ব্যবহার করলে, মানুষের মর্যাদাহানি হয়। এমনকি **J.S.Mill**-এর মত চিন্তাবিদও বলেছিলেন মানুষকে ধন হিসেবে ভাবা উচিত নয়, ধনের প্রয়োজন মানুষের জন্যে। আবার **Adam Smith, H. Von Thunen**-এর মতন চিন্তানায়করা এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে মূলধন হিসেবে মানুষকে মনে করা মানুষের পক্ষে কখনও মর্যাদাহানিকর নয়, বা মানুষের স্বাধীনতা এই ধারণার দ্বারা কখনও ক্ষুণ্ণ হয় না। **Schultz** বললেন যে মানব সম্পদ আর মানব-বহির্ভূত সম্পদ (Non-human)-এর পার্থক্য রয়েছে। এই প্রসঙ্গে নানান প্রশ্ন এসে পড়ে :

শিক্ষা কি কেবলই অর্থবিনিয়োগ, না শুধুই পণ্য বিক্রয় বা ব্যবহার (Consumption) যদি অর্থ বিনিয়োগই হয়, অন্যান্য অর্থ বিনিয়োগের তুলনায় এর ফসলের পরিমাণ কতটা? মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার অবদান কতখানি? আমরা শিক্ষাব্যবস্থাকে সংকোচন করে কতখানিই বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পারব? এইভাবে অবশ্য মানব সম্পদ-এর ওপর ব্যয়ের পরিমাণ ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। তবে একথা বলার

অপেক্ষা রাখে না যে মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষাকে পণ্য ব্যবহার বা বিক্রয় এবং অর্থ বিনিয়োগ দুভাবেই গ্রহণ করা চলে। শিক্ষা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকেও স্পর্শ করে আবার অর্থনৈতিক যাথার্থ্যও এর রয়েছে।

Schultz-এর মতে, মানব সম্পদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। একটি হল পরিমাণগত **(Quantitative)** আর একটি গুণগত **(Qualitative)**।

পরিমাণগত দিক হল লোকসংখ্যা, তাদের প্রয়োজনীয় কাজে পরিমাণ ও সময়সীমা। গুণগত দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নিপুণতা, জ্ঞান, আর উৎপাদনমুখী কাজকর্ম করার জন্য বিশেষ ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **Schultz** মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য আরও কতকগুলি বিষয়-এর দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেমন—

(১) স্বাস্থ্য পরিচর্যা—যা মানুষের ভবিষ্যত জীবনে কাজে লাগে। তার অস্থি দীর্ঘ হয়, সে সুস্বাস্থ্যে প্রাণোচ্ছল হয় এবং নানা কাজে তার উৎসাহ, উদ্দীপনা অনুকরণীয় হয়ে ওঠে।

(২) কাজের জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

(৩) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার স্তরগুলির প্রথাগত দিক থেকে সুবিন্যস্ত হওয়া দরকার।

(৪) বয়স্কদের শিক্ষা প্রকল্প গড়ে তুলতে হবে। কৃষিশিক্ষায় দৃষ্টি দিতে হবে।

(৫) অন্য দেশ থেকে আসা ব্যক্তি ও পরিবারদের নতুন কাজকর্মের সুযোগ সুবিধার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের দেশে **Indian Institute of Management (I.I.M)**-এর অধ্যাপক **U. Parikh** মানব সম্পদ-এর তাৎপর্যকে বিশেষ মর্যাদা দিলেন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

তাঁর মতে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি মূলত :

(i) অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির বিকাশ, **(ii)** ব্যক্তির বর্তমান কাজকর্মে সর্বশক্তি নিয়োগ করে উন্নতি করা, **(iii)** ভবিষ্যৎ কাজকর্মের দিকে তার যোগ্যতা বাড়ানো, **(iv)** ব্যক্তির ও তার সংস্থার লক্ষ্য সমন্বিত করা, **(v)** সকলের সঙ্গে মেলামেশার সম্পর্ক, সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করা এবং সুষ্ঠ কর্ম পরিবেশ গড়ে তোলা, **(vi)** সৃষ্টিশীলতাকে উৎসাহ দেওয়া ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো।

মানব সম্পদ বিকাশের ওপরে উল্লিখিত লক্ষ্যগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়— (১) একটি, ব্যক্তিমুখী মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি **(micro approach)**, (২) দ্বিতীয়টি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি **(macro approach)**। প্রত্যেকটি ব্যক্তির সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত এবং তার শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির সম্ভাবনাগুলির যথাযথ প্রতিপালন ও বিকাশই শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য। সমাজেরও ব্যক্তির কাছে অনেক চাহিদা রয়েছে। এই দুটি শিক্ষামূলক কৌশলের যোগফল হল শিক্ষায় অর্থনীতির প্রয়োগ **(Economics of Education)**।

১৯৬৪-৬৬ খ্রিস্টাব্দের কোঠারী কমিশন বা সর্বভারতীয় শিক্ষা কমিশন মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে বিশেষভাবে পড়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করা ও নিরক্ষরতা দূর করা, প্রত্যেককে শিক্ষার সম সুযোগ দেওয়া। তাছাড়া বিশেষ প্রয়োজন হল মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিমুখীনতা (Vocationalisation of Secondary Education)। মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা বহুক্ষেত্রেই কার্যকরী হতে পারছে না, তার বহু কারণ রয়েছে, মানব সম্পদ উন্নয়ন মূল্যায়ন করতে গেলে দেখতে হবে, কতজন প্রাথমিক শিক্ষা বা উচ্চতর শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে এবং কতজন উচ্চতর পেশাগত শিক্ষা গ্রহণ করেছে। দেখা যায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পরিবারগত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় এই পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্যে। শিক্ষায় অপচয়, অনুন্নয়ন (Wastage and stagnation) বিশেষ বাধা সৃষ্টি করছে। তাছাড়া রয়েছে বেকারত্ব (Unemployment), ক্ষমতা অনুযায়ী চাকরী না পাওয়া (Under employment) ইত্যাদি। এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা আমাদের ভারতীয় পটভূমিকায় নতুন নয়, এই শব্দগুচ্ছগুলি ব্যবহার না করলেও শিক্ষার দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলিকে পরিস্ফুট করা, তাকে বৃত্তিমুখী করা, বিভিন্ন পেশায় তার প্রকৃতি প্রবণতা অনুসারে প্রশিক্ষণ দেওয়া, শিল্পায়ন গড়ে তোলা ইত্যাদির ধারণা, কার্যকরী পরিকল্পনার দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে—বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধীর শিক্ষা ও সমাজ ভাবনায়। ১৯৯৬ সালের Delors' Commission বারবার মানুষের ব্যক্তিগত দক্ষতার কথা বলেছেন। শিক্ষার কাজ হবে সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণ এবং তার মূল কেন্দ্রটি হবে মানব সম্পদ বিকাশ।